লাদাখ

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের সূচনায় একটি হিমালয় বর্ণনা আছে। কবি বলছেন- উত্তরদিকে আছেন দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়। তিনি পূর্বাপরের নদীধারাবিধৌত হয়ে পৃথিবীকে দ্বিধাবিভক্ত করে মাঝখানে মানদণ্ডের মত বিরাজ করছেন। এই কথাটির প্রকৃত অর্থ লাদাখ গিয়ে যেমন করে বুঝলাম তেমন করে আগে বুঝিনি।

হিমালয়ের দক্ষিণ ও উত্তরভাগে আকাশপাতাল তফাৎ। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে উড়ে আসা মৌসুমী মেঘ পর্বতমালায় বাধা পেয়ে হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এদিকে তাই ঘন বন এবং অজস্র নদী। এদিকেই আছে ফুল ফল, পশুপক্ষী, শস্যক্ষেত্র, লোকালয়, ছোটবড় শহর ও গ্রাম এবং অজস্র তীর্থক্ষেত্র। এখানে প্রতি নদী সঙ্গমে মন্দির, প্রতি পাহাড়চূড়ায় মন্দির। এ দেশের নাম দেবভূমি। এ দেশ ভক্তের বাঞ্ছিত ও ভ্রমণকারীদের স্বর্গ।

হিমালয়ের উত্তর ঢাল বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল। মনুষ্যবসতিহীন, তহীন, তৃণহীন, প্রানীহীন মদেশ। এদিকে ভূমি ত্রমশঃ উঁচু হতে হতে তিববতের দিকে চলে গেছে। জাঁসকর ও পিরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেনীর অসংখ্য শিখর যেন অসংখ্য প্রস্তরীভূত সমুদ্র তরঙ্গ। এদিকের গড়পড়তা উচচতাই বারো চোদ্দ হাজার ফিটের বেশি। উঁচু চূড়াগুলি চিরতুষারে ঢাকা। সেখান থেকে ছোট বড় তুষারপ্রবাহ গলে গিয়ে নীচের দিকে নেমে আসে। দূর থেকে এই গলনশীল তুষারস্রোত গুলিকে কালো পাহাড়ের গায়ে লম্বমান সাদা রেখার মত দেখায়। নিচের দিকে বরফরাজ্য যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে শুধুই পাথর। তারও নীচে উপত্যকার কাছাকাছি খুব বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ততটা নেই। মাঝারি আকারের নানারকম পাথর আর স্তূপীকৃত কাঁকর ও বালি। সবুজ কোথাও নেই। শুধু সাদার মুকুট পরা ধূসরের দেশ। ধূসর কথাটি অবশ্য পুরোপুরি খাটে না। কারণ এ ধূসর বহুরূপী। দিনের আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলোছায়ার স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নগ্ন পাথরের গায়ে ধূমল ও গৈরিকের অজস্র সেড খেলা করে। মানুষের আঁকা ছবি হলে এত সূক্ষ্ম বর্নবিভঙ্গ সেখানে মিলত না।

সীমান্ত অঞ্চল বলে জনমানবহীন এই ভূখGেr রাজনৈতিক গুত্ব খুব বেশি। এই কিছুকাল হল এর ভিতরে ভিতরে বেশ কিছু চওড়া পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে। এবং পর্বতশৃঙ্গ, নদীধারা ও উপত্যকাগুলি জরিপ করে নির্ভরযোগ্য মানচিত্র বানানো হয়েছে। সন্ধিস্থলগুনিতে আছে সৈন্যশিবির। সৈন্যশিবির থাকলেই আধুনিক সভ্যতার কিছু কিছু সুবিধা আপনি আসে। এই সব কারণগুলির ওপর ভরসা করে ইদানিং এ অঞ্চলে কিছু কিছু টুরিস্ট আসছে। তাদের একটা বড় অংশ ইউরোপ আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ লোক। এরা পোত্ত ভ্রমণকারী। যাবতীয় মালপত্র নিজের শরীরে ঝুলিয়ে নিয়ে এরা অক্লেশে ভূপর্যটন করে বেড়ায়। স্বদেশের জলবায়ুর ও ভূপ্রকৃতির সঙ্গে এদেশের মিল থাকায় ভারতীয় ভ্রমণকারীদের চেয়ে এরা অনেক স্বচ্ছন্দ। তুলনায় ভারতীয় /বাঙ্গালীরই সংখ্যাধিক্য - ভ্রমণকারীরা যেন কিছু দ্বিধাগ্রস্ত। যুবক ভ্রমণকারীদের দল দেখতে পেলাম না। হয়ত তাঁরা ট্রেকিং এ আসে ভিন্ন পথে। পথে ঘাটে যাদের দেখলাম তাদের প্রায় সকলেরই যৌবনকাল পার হয়েছে। শিশুসন্তান নিয়ে যাঁরা সপরিবারে ভ্রমণে বেরোন তাঁরা লাদাখে আসেন না। কারণ ভ্রমণ এখানে কষ্টসাধ্য। ব্যয়বহুল এবং অংশতঃ অনিশ্চিত। তীর্থযাত্রীরা এদিকে আসেন না কারণ এখানে কোনও তীর্থস্থান নেই। এখানে প্রধান ধর্ম বৌদ্ধধর্ম। সব মিলিয়ে এই আগষ্টে যখন ভ্রামনিক পরিভাষায় এদেশের সিজন্ তুঙ্গে তখনও খুব একটা টুরিস্টের ভিড় নেই। যাঁরা এই প্রকার সিজনে ভিড়ে গিজগিজ করা দার্জিলিং নৈনিতাল দেখে এসেছেন তাঁদের কাছে এই জনবিরলতা বড়ই আরামদায়ক।

আমাদের লাদাখ যাত্রা সু হয়েছিল মানালি থেকে। সদস্যসংখ্যা বাইশ। সকলেই হয় প্রবীণ নাগরিক অথবা তার কাছাকাছি। এই বয়সে আমাদের বাপজ্যাঠারা টুরিস্ট হয়ে দেশভ্রমণ করতে বেরোতেন না। বরং ঘরে বসে হরিনাম করতেন। যদি বা কারও সৃষ্টিছাড়া শখ ও সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ সঙ্গতি থাকত তিনি হয় চেঞ্জে নয়ত তীর্থে যেতেন। কিন্তু আমরা তাঁদের মত স্বাস্থ্য বা ধর্ম কোনোটারই অভিলাষী নই। আমরা ছেলেছোকরাদের মত গলায় বাইনাকুলার ও ক্যামেরা ঝুলিয়ে

সুন্দরের সন্ধানে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। কেন আমাদের স্বভাবটা এইরকম হল কেন সে বিষয়ে আমি মাঝে মাঝে ভাবি এবং ভেবে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে বিশেষ কতকগুলো সামাজিক কারণে আমাদের এইরকম স্বভাবটা তৈরি হয়েছে। আমরা সন্ধিযুগের ফসল। আমাদের জন্ম হয়েছে পরাধীন ভারতে কিন্তু চোখ ফুটেছে স্বাধীন ভারতে। স্বাধীনতার আগে শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর /আমরা মোটামুটি এই শ্রেনীভুক্ত - জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবনের গন্ডীটা ছিল খুব বাঁধাধরা। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা দেশভাগ ও স্বাধীনতা আমাদের ভাগ্যকে ওলোটপালোট করে দিয়েছে, অশেষ দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে পুরনো অচলায়তন ভেঙে এক বৃহত্তর জীবন সংগ্রামের মধ্যে আমাদের শক্তিপরীক্ষার সুযোগও দিয়েছে। স্বাধীনতার পরে নতুন নতুন শিল্পবাণিজ্য শিক্ষা চাকরি এসবের সুযোগ এল। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এল স্ত্রী সমাজে। আমরাই বোধহয় প্রথম প্রজন্মের নারী যারা একসঙ্গে চাকরি ও সংসার দুটোই করেছি। অ ামাদের আগে যে সব মেয়েরা বহিঃসংসারে আসতেন তাঁরা হয় চিরকুমারী, নয়ত বালবিধবা, অথবা বিখ্যাত লোকের পত্নী। আমাদের কালে এসে তার পরিবর্তন হল। আমাদের কালের মেয়েরা দুটো কর্মক্ষেত্র পেল - সংসার ও চাকরি। অ ামাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল দুটোই ভালোভাবে করে দেখাবার। আজ একথা স্বীকার করতেই হবে স্ত্রী পুষ সবাই আমরা যেখান থেকে জীবন সু করেছিলাম সেখান থেকে অনেকদূর অবধি চলে আসতে পেরেছি। কথা এই নয় যে আমরা গরীব থেকে কিঞ্চিৎ সচ্ছল হয়েছি, বা অখ্যাতি থেকে ঈষৎ প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। কথা এই যে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে নতুন ধারার জীবনযাপনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিজেকে মানিয়ে নিতে নিতে নিজেদের শক্তিকে আবিষ্কার করেছি ও ব্যবহার করেছি। এই কাজ করতে করতে নিজ অন্তরে একদা শক্তির একটা অফুরান উৎসের সন্ধান মিলেছিল। আজ অপরাহ্নবেলায় তা ক্ষীণস্রোত ও মন্দীভূত হয়ে এলেও একেবারে মরে যায় নি।

আমাদের বাণপ্রস্থের চেহারা তাই আলাদা। চাকরিজীবন সমাপ্ত বা সমাপ্তপ্রায়। সংসারজীবনে ছেলেমেয়েরা স্বনির্ভর। সংসার ও কর্মক্ষেত্রকে যা দেবার ছিল দেওয়া হয়ে গেছে বলে এখন আমরা শরৎকালের মেঘের মত দায়হীন ভারহীন। অথচ আমাদের অনুভবশক্তি আছে, বিস্ময়বোধ আছে, সুন্দরের সামনে দাঁড়ানে এখনও মনে হয় জগতে আনন্দযজ্ঞে আম ার নিমন্ত্রণ।

আগস্টের মাঝামাঝি এক প্রভাতে এইরকম একটি দল মানালি থেকে পশ্চিম মুখে লের উদ্দেশে যাত্রা শু করেছিল। স্থলপথে লে অতি দুর্গম। ওখানে পৌঁছবার দুটি রাস্তা।প্রাচীন পথ ছিল শ্রীনগর থেকে সিন্ধুনদের ধার ঘেঁষে। এই পথ অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু অত্যন্ত দীর্ঘ। পরবর্তীকালে মানালি থেকে ম ভেদ করে নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে। এটির দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম বলে আমরা এটাই বেছে নিয়েছি। প্রথম দিকে পার্বত্যপথের একধারে উচ্চভূমি ও পাইনবন এবং অপরদিকে খাদ ও নদী এই ছিল নিসর্গচিত্র। রোটাং পাসের কিছু আগে থাকতে এ দৃশ্য বদলে গেল। এল ক্ষ মদেশ। সার াদিন ধরে অবিরাম আমরা এ পথে চলেছিলাম। মধ্যে অনেক গিরিবর্ত্ম ও উপত্যকা পার হতে হয়েছিল। তাদের নামধাম, উচ্চতা তাপমান ইত্যাদি তথ্য বাদ দেওয়া গেল, কারণ তা ভূগোল ও ভ্রমণের সব বইয়েই আছে।

সুন্দরের প্রচলিত ধারণায়্ এ দেশকে সুন্দর বলা যাবে না। কারণ কোমল মধুর কিছুই নেই। কিন্তু ভয় ও বিস্ময় জাগানো যে বিরাটত্বের অনুভূতি আমাদের অধিকার করেছিল তা এক ভিন্নতর সৌন্দর্যের দান। চলমান বাসের দুধারে গড়িয়ে য াচ্ছে মাইলের পর মাইল। এতখানি পথ এলাম। এর মধ্যে কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। ঘাস পর্যন্ত নয়। মুখ্যতঃ সেন াবিভাগ ও গৌণতঃ টুরিস্টদের প্রয়োজনে তৈরি এই পথে সাধারণ পথিকের পদচিহ্ন পড়ে না। আশপাশের ভূভাগের মত এই পথও তাই অধিকাংশ সময় জনশূন্য পড়ে থাকে। পাহাড়ের নিঃসীম একাকীত্ব তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই পাহাড় আকাশের নীচে একভাবে পড়ে আছে। আরও লক্ষ লক্ষ বছর হয়ত থাকবে। তবু মহাকালের লীল ায় এখানেও প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে এক ভৌগোলিক বিবর্তন। দিনের বেলার প্রখর রোদে পাথর প্রসারিত হয়। রাতে ঠ াGাায় সংকুচিত হয়। এই সংকোচন ও প্রসারণ চলতে চলতে পাথরে ফাটল ধরে। তারপর তা ভাঙ্গে। তারপর পাথরের ঘর্ষণে, বাতাসের ধাক্কায়, হিমপ্রপাতের চাপে, অথবা আকস্মিক কোনো প্রবল বর্ষণে আলগা পাথর চূর্নবিচূর্ন হয়ে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে মহাশব্দে ধসের মত নীচের উপত্যকায় আছড়ে পড়ে। সেখানে বড় বড় বালিয়াড়ি তৈরী হয়। এইরকম অসংখ্য বালিয়াড়ি এখানে আছে। উপত্যকায় তাই শক্ত পাথর ও কাঁকর বালির সহাবস্থান। ধূম জ্যোতি সলিল মতের সন্নিপাতে আর্শ্চর্য সব ভাস্কর্য্য এখানে দিনরাত রচিত হচ্ছে। পাহাড়ের নরম অংশগুলি ক্ষয়ে গিয়ে বাকি যা দাঁড়িয়ে আছে দূর থেকে

তাকে মনে হয় যেন কোনো পুরনো প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। কখনো তা আকার নিয়েছে সারিবদ্ধ খিলানের, কখনো বা অতিকায় উইঢিবির। কখনো বা ঈষৎ সমতল উপত্যকায় কোঁকড়া চুলের মত কুঞ্চিত বালি। ঘননীল অনন্ত আকাশের নীচে স্বর্নবর্ন অনন্ত মদেশ।

গ্রহান্তর গামী মহাকাশযানের মত আমাদের বাস ঐ পথে একা ছুটছিল। ত্রমশঃ চারিদিক থেকে ঘিরে ধরা এই ভয়াল প্রকৃতি আমাদের মধ্যে আর এক ধরনের বিত্রিয়া আরম্ভ করে দিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি, বাসের ঝাঁকুনি, ত্রমোচ্চ গিরিপথে ঘন ঘম বাঁক এবং অক্সিজেনের অভাব। বিকেল হয়ে গেল। পাহাড়ের ওপর সূর্যাস্তরঙ্গীর খেলা আমাদের আর চোখে পড়ল না। অমাদের শরীর চাইছিল আশ্রয়। মন চাইছিল জীবজগতের সান্নিধ্য। ১৯২৭-২৮ সালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন ভাগলপুরে এক জঙ্গলমহালে চাকরি করেছিলেন। ঐ জনশূন্য মহালে মাঝে মাঝে রৌদ্রলোকে ধূ ধূ করা দিগন্তের দিকে চেয়ে তাঁর মনে পড়ত মার্কোপোলো, শ্যেন হেডিনদের কথা। টাকলামাকান মভূমির কথা। জ্যোৎস্না রাতে একা মাইলের পর মাইল কতবার ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে তাঁর ভয় হয় নি এক অপার্থিব আনন্দে মন ভরে গিয়েছে। সেই সব সময়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ঋপ্রকৃতির দ্রপের একটা আলাদা আকার্ষন আছে এবং সে আকর্ষন সবার জন্য নয়। গৃহসুখী পোষমানা প্রান যাদের তারা এ রাজ্যে অনধিকারী। সেদিন প্রমান হয়েগেছে আমরা ঐ অনধিকারীর দলেই পড়ি। কষ্টের সময় ঋপ্রকৃতি আমাদের চোখের সামনে থেকে মুছে যায়। চিরকালের অভ্যস্ত সংসারই শ্রেয় হয়ে ওঠে। প্রবীণ দম্পতিরা পরস্পরের চোখে ভরসা খুঁজছিলন। আর যাঁরা একা এসেছেন তাঁদের আচ্ছন্ন চেতনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল প্রয়াত ও প্রবাসী প্রিয়জনেরা । অবশেষে ঘনায়মান সন্ধ্যালোকে সারচুর সৈন্যশিবির দেখা দিল। মানুষ। তারপর আমাদের তাঁবু।

পরদিন সারচুর আকাশে এক অলৌকিক সূর্যোদয় হয়েছিল। দাবানলের মত তার আগুনের ছটা। কিন্তু তা এতই অল্পকালস্থায়ী যে অনেকেরই চোখে পড়ে নি । তারপর আবার যাত্রা সু হল এবং পূর্বদিনের পুনরাবৃত্তির পর বিকেলে আমরা পৌঁছে গেলাম লাদাখের রাজধানী লে শহরে।

লে শহরের গড়ন ঠিক বাটির মত । বেশ খানিকটা প্রায় সমতল জায়গাকে গোল করে ঘিরে আছে নাতিউচ্চ পর্বতমালা। তার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে আরও উঁচু আর একসার পর্বতমালা। তাদের চুড়ায় বরফের ঝিকিমিকি। এই পর্বত বেষ্ঠনীর মধ্যে থাকার ফলে লে শহরের আবহাওয়া তুলনামুলক ভাবে অনেক উষ্ণ ও মনোরম।

পর্বতমালা একদিকে বাইরের ঠান্ডা হিম বাতাস আটকে দিয়ে উপত্যকাকে গরম রাখছে। অপর দিকে ঐ পর্বত থেকেই হিমবাহগলিত জলধারা গুলি উপত্যকায় নেমে এসে ছোট ছোট নদী ও ঝর্নার সৃষ্টি করেছে। উত্তর ভারতের সমভুমিতে প্রানপ্রবাহিনী নদী যেমন গঙ্গা তেমনিই হিমালয়ের উত্তরদিকের প্রানপ্রবাহিনী নদী হল সিন্ধু। শ্রীনগর থেকে সিন্ধুর জলধারার পাশে পাশে চলে এলে ঐ অঞ্চলের যাবতীয় লোকালয় গুলি ছুঁয়ে আসা যায় । অতীত কালে যখন আর কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না তখন এই সিন্ধুই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পথ চিনিয়েছে। এই দুর্গম দুরদেশে সিন্ধুর অববাহিকায় কিছুদুর পর পর তাঁরা গুম্ফা বা বিহারগুলি স্থাপন করে গিয়েছিলেন। সিন্ধুনদী অবশ্য লাডাখের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নয়। শহরের কিছু দক্ষিনে তার অবস্থান। কিন্তু শহরের ভেতর দিয়ে অনেকগুলি ছোট ছোট স্বচ্ছ ণীর্ন জলধারা বয়ে গিয়ে অবশেষে সেখানে পড়েছে। এর ফলে স্থানটি সরস এবং মনুষ্য বসবাসের যোগ্য হয়েছে। এখানে আছে গাছপালা ও চাষের খেত। চতুর্দিকে নির্মীয়মান পাকা বাড়ি দেখে বোঝা যায় এখানে লোক সংখ্যা বাড়ছে। বাজার দেখে সেখানকার অর্থনীতি বুঝতে চাই লে বলতে হবে এখান কার বাজার হাট খুব ভালো। টাটকা তরিতরকারি ফল মুল মাংস, ডিম যথেষ্ট। নানা আকারের মুদিদোকানে আজকালকার ভোগ্যপণ্য প্রায় সবই মেলে। স্থানীয় শিল্পদ্রব্য ও পশমবস্ত্রের দোকানগুলি টুরিস্ট আকর্ষন করবার মত করে সাজানো। ছোট ছোট পসারীরা পথে পাথর সেটিং ঝুটো গয়না আর পিকচার পোস্টকার্ড বিত্রি করছে। Ûü.¿é.¿ë বুথ এবং ভ্রমন সংস্থার অফিস গুলি ঝকঝকে করে সাজানো। এমন কি শহরের ঘনতম বসতি অঞ্চলে বাসস্টান্ডের কাছাকাছি রয়েছে তিববতি রিফিউজিদের হকার্স কর্নার। সেটি গরীব মানুষের শস্তার

কেনাকাটার জায়গা। বড় রাস্তা থেকে যে সব স স পাথর বাঁধানো গলিপথ বেরিয়েছে সেখানে স্থানীয় মানুষ জনের পাড়া। শহর অঞ্চলের এই গৃহস্থেরা চাকরি বা ব্যবসা করে। অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। অনেকের ঘরেই স্কুটার । পরিচ্ছন্ন ঘরদোর। একটুখানি ফুলের বাগান। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। এরা শিক্ষিত ভদ্র এবং বিদেশীদের সম্বন্ধে সহনশীল। এদের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় না। সাধারন মানুষের জীবন সংগ্রাম কঠিন। শীতের দেশ বলে ওদের কষ্ট অনেক বেশি। তারা কঠোর পরিশ্রমী, তবে স্বাস্থ্যহীন নয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রেয়ার হুইলের চত্বরে এদের শিশুরা খেলা করছে। নানা স্থানে রংবেরঙের তেকোনা পতাকার মালা টাঙানো। সারা লাদাখ জুড়েই অবশ্য এরকম পতাকার মালা চোখে পড়ে। আবহাওয়া শুকনো রৌদ্রময়। কখনো সখনো মেঘলা হলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। আমাদের দেশে যেমন বৃষ্টির শব্দ ও রূপের সীমা নেই এখানে তা নয়। নিঃশব্দে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হয়। বেশিক্ষন হয় ও না । তবু তাতেই আবহাওয়া ঠান্ডা হয়ে গিয়ে দূরে পাহাড়ে তুষার পাত ঘটে আর নদী নির্ঝারিনী গুলি স্ফীত হয়ে সবেগে ছোটে। ওপর ওপর এই হল লে র চেহারা।

লা শব্দের অর্থ গিরিবর্ত্ম যেমন লাচুং-লা, খারদুং লা, বারলাচা-লা, নাথু-লা ইত্যাদি। লে শব্দের অর্থ কি জানি না। অর্থটা গিরিক্রোড় হলে মন্দ হত না, কারন পাহাড় এখানে গোলাকার উপত্যকাটিকে কোলে করে আগলে রেখেছে। প্রাকৃতিক সুবিধার জন্য যেমন আজকের লে তৈরি হতে পেরেছে তেমনি প্রাচীন কালে এই কারনেই গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র। পশ্চিমে লামায়ুর থেকে পূর্ব দক্ষিনে উপসি পর্যন্ত সিন্ধুর ধারে ধারে মালার মত যে সব বৌদ্ধ গুম্ফা রয়েছে তাদের একটি বড় অংশই লে কেন্দ্রিক। শহরের উপকণ্ঠে সবে মাত্র যেখানে পাহাড়ের সু তার ঈষদুচ্চ ঢালের ওপরে হেমিস, স্টক, থিপসে, সাবু, সংকোট, ফিয়ং, তিস্ প্রভৃতি অনেক গুম্ফা রয়েছে। ঐ ঢালেই রয়েছে প্রাচীন দূর্গ ও রাজপ্রসাদ, এবং আধুনিক কালে সংযোজিত শান্তিস্তূপ। দূর অতীতে এই স্থানগুলি যাঁরা বেছেছিলেন তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। গুম্ফার চত্বরে এসে দাঁড়ালে যেমন নীচে সমগ্র লোকালয়টি দেখা যায়, নিচু থেকে উপরে চোখে পড়ে গুম্ফার চূড়া। মানুষ ও দেবতা এখানে পরস্পর কে লক্ষ্য করছে। তারা পরস্পরের পরিপূরক।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে এই জনসংযোগের ব্যাপারটা চিরকাল ছিল। এইখানেই প্রাচীন হিন্দুর সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধের তফাৎ। তখন কার কালে হিন্দুর সাধনা ছিল আত্মানুসন্ধানের। এবং তা নির্জনে একাকী। লৌকিক জীবনের ওপর পূর্নচ্ছেদ টেনে দিয়ে তাঁরা সন্ন্যাস নিতেন। বৌদ্ধের ছিল সম্মিলিত সাধনা। তাঁরা সংসার ছেড়ে প্রব্রজ্যা নিলেও তাঁদের চেষ্টা থাকতো চেনা শোনা লোককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সদ্ধর্মের পথে টেনে আনবার । স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ এ কাজ করেছেন, পরবর্তীরা তো বটেই। সে যুগের আইনেও এর সমর্থন মেলে। কোনো হিন্দু সন্ন্যাস নিলে সম্পত্তিতে তার অধিকার থাকতো না। কিন্ত কেউ বৌদ্ধ হয়ে সংঘে যোগ দিলে সে তার সম্পত্তি সংঘকে দান করতে পারতো। এই ভাবে অতীতে বৌদ্ধ বিহার গুলি এক একটি বহুশাখায়িত সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। সেখানে যেমন ত্যাগী অহৎ রা থাকতেন তেমনই থাকতেন সংঘ পরিচালনা পটু প্রশাসকরা। থাকত শিক্ষানবিশ ভিক্ষু (ছাত্র) দল। সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আসত গৃহীরা। আসতেন সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী। লোকসমাজে সাধুরা ধর্মোপদেশ দিতে যেতেন। এই ভাবে আর্থিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ ক্ষমতাই গুমফাগুলির ছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয় হলে তার অপব্যবহারও কম হয় নি।

আজকে হিন্দু সাধুসন্ন্যাসীরা অনেকেই এ প্রকার আশ্রমিক হয়েছেন, কিন্ত অতীতে তাঁরা কোনো কর্ম বন্ধনে নিজেকে জড়াতেন না। বহতা নদীর সঙ্গে তুলনা করা হত রমতা সাধুর, কারণ তাঁরা নিয়ত চলনশীল। এই রকম চলার পথে হয়তো কেউ কখনো বিশেষ কোনো একটা জায়গায় এসে অন্তরে লাভ করেছিলেন ঈশ্বরের স্পর্শ। সেই স্থানটিকে পবিত্র বলে চিহ্নিত করেছিলেন পরবর্তী পথিকদের জন্য। তার পর যুগের পর যুগ ধরে ক্রমান্বয়ে সেখানে জমা হয়েছে মানুষের ভক্তি বিশ্বাসের অর্ঘ। এই ভাবে গড়ে উঠেছে হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রগুলি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যেখানেই প্রকৃতির কোনো ব্যাখ্যাতীত বিস্ময় বা গভীর কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে সেই সমস্ত জায়গাতেই প্রাচীন সাধুরা কল্পনা করেছেন ঈশ্বরের

মহিমা। তা সজনে না নির্জনে সে বিচার করেন নি। বিন্দু বিন্দু জলবর্ষণে দুর্গম পর্বতগুহার অভ্যন্তরে বিশেষ তিথিতে যেখানে তৈরি হয়ে ওঠে তুষারলিঙ্গ সেইখানে আছেন অমর নাথ। স্বর্গ নদী মন্দাকিনী ও অলকানন্দার কোলের কাছে কেদারনাথ, বদরীনাথ। গঙ্গার উৎস গোমুখ, অন্তে গঙ্গাসাগর, গঙ্গা যেখানে সমভুমি ছুঁল সেই নীলধারার কূলে হরিদ্বার, গঙ্গা, যমুনা সরস্বতী সঙ্গমে প্রয়াগ, গঙ্গা বনা অসি সঙ্গমে বারানসী। তিন সমুদ্রের মিলনস্থানে কন্যাকুমারী, পাহাড়চূড়ার গোপন গিরিকন্দরে বৈষ্ণোদেবী। যুগ যুগ ধরে কষ্ট করে তীর্থ যাত্রীরা সেখানে গেছে। তাদের সরল বুদ্ধিতে মনে হয়েছে পথশ্রমের কষ্ট স্বীকার করলে দেবতা তুষ্ট হবেন। এই ভাবেই চলছিল। পরে অধুনিক সভ্যতার কলুষ মানুষের মর্মে ঢুকে গেলে ধর্মব্যবসায়ীরা এখানে এসেছিল লাভ করতে। একেবারে হাল আমলে এসেছে রাজনীতি ব্যবসায়ীরা। অনেক জায়গাতেই এখন মেটাল ডিটেকটর, খানাতল্লাশি, আর দন্ডধারী শান্তিরফকদের দাপাদাপি। আর ঈশ্বর· তাঁর অনন্ত ভুবনে স্থানের অভাব নেই।

যাই হোক সে সব অবান্তর কথা। লাদাখের বৌদ্ধ গুম্ফাগুলির প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। বলা বাহুল্য এদের অতীত সুসময় আর নেই। তবে নানাপ্রকার অনুদান আছে বলে মোটামুটি চলে যায়। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অধিকাংশ স্থানেই অতীশ দীপংকরের নাম রয়েছে। তাঁর মূর্তিও (অবশ্যই কাল্পনিক) রয়েছে। কথিত আছে বৃদ্ধ বয়সে চিন সম্রাটের আমন্ত্রনে দীপংকর শ্রীজ্ঞান সেদেশে চলে গিয়েছিলেন। আর ফিরে আসেন নি। সেই দুর অতীতে যখন না ছিল যানবাহন। না ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা। তখন কী সাহসে, কোন আদর্শের টানে দীপংকর এই পথ পার হয়ে গিয়ে ছিলেন তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। কেবল এই সব দুর্গম বিহারে তাঁর শেষ যাত্রার ইতিহাস কিংবদন্তী রূপে ভেসে বেড়াচ্ছে।

দশদিন কেটে গেছে। মানালি থেকে লে - এই অলৌকিক যাত্রাপথের প্রথম বিস্ময় আমরা কাটিয়ে উঠেছি। আমরা এখন লে শহরের নির্বাণপ্রাসাদ হোটেলের পুরানো বাসিন্দা। প্রতিদিন সকালে বাসবন্দি হয়ে আমরা নানা স্থানে যাই এবং সন্ধ্যায় পাখির মতো বাসায় ফিরি, কখন বা ফিরিও না। সোমোরিরি হ্রদের ধারে এক রাত কাটিয়ে আসি হ্রদের জলে রঙের খেলা দেখব বলে। এদেশের জলবায়ুতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলে অক্সিজেনের অভাবে আর কষ্ট হয় না। কত ম, পর্বত, হিমবাহ,নির্ঝারিনী, কত গিরিবর্ত্ম গিরিখাত কত গুম্ফা, কত মূর্তি , কলনাদী সিন্ধুর পাশে পাশে কত না ভ্রমন এই ক দিনে সমাধা হল। এদেশের তথাকথিত দ্রষ্টব্যগুলি সবই দেখা হয়েছে। কেবল খেদ রয়ে গেল দেশটাকে ভেতর থেকে জানিনি বলে। মাইলের পর মাইল জনহীন প্রান্তরের মধ্যে এক টুকরো শীর্ন নদী। তার পাশে যৎসামান্য ঘাসের আস্তরন । ওখানে আছে একটি লাদাখি গ্রাম। দু পাঁচঘর মেষপালক, একপাল ভেড়া। এইটুকুই। তার খুপরি পাথরের ঘরের যে জীবনযাত্রা,যে সুখদুঃখ, আধুনিক সভ্যজগতের সব রকম উপকরন বর্জিত হয়ে যে বংশ পরম্পরা তার ভেতরের কথা জানা হয় নি। লামায়ুরু বিহারের ছাদে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পোষাক পরা একদল ছোট ছোট ছেলে দুপুর বেলা চাউ এর মতো কি একটা খাচ্ছে। ঐ তাদের মধ্যাহ্ভোজন। বড় লামা জানালেন ওরা ভিক্ষু হবার ট্রেনিং এ আছে। ভিক্ষুবৃত্তি তাহলে একটা জীবিকা খৃষ্টীয় চার্চের মত। কোথা থেকে এসেছে এই ছেলেগুলি। কি ভাবে কাটবে তাদের জীবন, অজ্ঞাত রয়ে গেল। সঠিক ভাবে কোনো দেশের ভিতর বাহির জানা টুরিস্টের কর্ম নয়। তা করতে গেলে এখানে থাকতে হয়। সব রকম মানুষের সঙ্গে খেলা মনে মিশতে হয়। পালে পার্বনে যোগ দিতে হয়। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হয়। অত সময় আমাদের নেই। প্রস্তুতিও নেই। আমরা তাই শুধু ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে যাই। লিস্ট মিলিয়ে দেখি, আর ঝপাঝপ ছবি তুলি।

হোটেল টি আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। একে আমরা ঘর বাড়ি বানিয়ে ফেলেছি। সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়াই। কর্তৃপক্ষ তাতে অসন্তুষ্ট হয় না। নতুন দেশে আসার প্রাথমিক উত্তেজনা থিতিয়ে যাবার পর আমরা আবার আমাদের গার্হস্থ্য অভ্যাসের কাছে আত্মসমর্পন করবার জন্য অজান্তে উদগ্রীব হয়ে আছি। তাই মহানন্দে একরাশ কাপড় চোপড় কেচে ছাদে উঠে শুকোতে দিই। চায়ে চিনির পরিমান এবং স্বাস্থ্যের ওপর তার ফলাফল নিয়ে বিশেষরূপ ভাবিত হই। লাউঞ্জের উৎকট টিভি সেটের সামনে বসে রিমোট টিপে টিপে জানতে চেষ্টা করি কোন সরকারে কি ইন্দ্রপতন ঘটল অথবা কোন শহরে কটা বোমা ফাটালো জঙ্গীরা। দলের কিছু পুষ সদস্য তাস নিয়ে এক কোনে বসে যান। তাঁদের মগ্ন মুখচ্ছবি দেখে মনে হয় না তাঁরা কোনো নতুন দেশে এসেছেন। মনেহয় তাঁরা আরামে বসে আছেন তাঁদের হুগলির বাড়ির বৈঠকখান

ায়। মহিলাদের ক্ষুদ্র পেটিকা থেকে যেন মন্ত্রবলে বেরিয়ে আসে রাশি রাশি পোষাক পরিচ্ছদ। তারাসেগুলি গায়ে চাপিয়ে চারদিকে ইন্দ্রধনুচ্ছটা বিকীর্ন করতে থাকেন। তাঁরা আর পথশ্রমে ক্লান্ত হন না। সারাদিন বেড়িয়ে হোটেলে ফেরামাত্র তাঁরা আবার মহোৎ সাহে বেরিয়ে পড়েন উপহার সামগ্রী কেনবার জন্য । পত্নীর কেনা কাটায় বিস্ময়কার অগ্রগতি দেখতে দেখতে কোনো দূরদর্শী পুষ কিনে ফেলেন মস্ত বড় ব্যাগ।

পাহাড় এখানে হাল্কা হাওয়ায় বোনে, হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে। খারদুংলা । আমাদের অভিজ্ঞতার আর একটা মাইলস্টোন। এটা পৃথিবীর সর্বোচচ সড়কপথ ।এ দেশ চিরতুষারের দেশ। বাস যত উঁচুতে উঠছে ততই কাছে চলে আসছে সাদা কালো নকশাদার পাহাড়। ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে যে ঝরনাধারা নামছে তারা শুধুমাত্র জলের ধারা নয়। জল ও বরফে মেশানো প্রবাহ। পাথরের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে ওঠা জল মূহূর্তে পরিনত হচ্ছে তুষারে। গলে যাওয়া মোমবাতির মত তা ঝর্নার ধারে ধারে শিকড় বাকড়ের মত ঝুলে আছে। ত্রমে কালোর ভাগ কমে গিয়ে সাদার ভাগ বাড়তে থাকল এবং অবশেষে এল গিরিপথের শীর্ষবিন্দু।

এখানে সৈন্য শিবির আছে। পাথরের তৈরি কয়েক টা থুপরি আর কয়েক টা তাঁবু। একটা ছোট দেবস্থান। উঁচু দন্ডে রংবাহারি পতাকার মালা তীব্র হাওয়ার ঝাপট খাচ্ছে। পিছনে ওয়াচ টাওয়ার। সামনে কয়েকটা ট্রাক। ফৌজী পোষাক পরা একদল যুবক। তাপমান এখানে হিমাঙ্ক পেরোনো। বন্ধ বাসের উষ্ণতা থেকে হঠাৎ এখানে নেমে আমাদের দৃষ্টি খানিকটা আচছন্ন হয়ে আছে। একটা ঘোরের মধ্যে থেকে দেখা গেল আকাশের অতিগভীর নীল, রোদের অতি তীব্র ঝলক। ঝোড়ো হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে উড়ে যাবার মত পতাকা গুলির ডানা মেলা ভঙ্গি, আর অবিশ্বাস্য শীতলতা। এই প কথার জগতে আমরা পাঁচ দশ মিনিটের জন্য বেড়াতে এসেছি। আমরা তো মুগ্ধ হবই। কিন্তু যাদের এখানে বাধ্যহয়ে দিনের পর দিন কাটাতে হয় সেই অল্প বয়সি ছেলে গুলির জন্য মায়া হল।

নুবরা উপত্যকা ও হুন্ডার গ্রাম লাদাখি ভূপ্রকৃতিতে ব্যতিত্রম এবং বোধ হয় সেইজন্যই ভ্রমনকারীদের দ্রষ্টব্য বস্তু, এখানকার উচচতা কম। তাই শীতও কম। ভূমি অপেক্ষাকৃত সমতল। যথেষ্ট গাছপালা আছে, নদী ও ঝর্না আছে, এবং আশ্চর্যের বিষয় তারই মধ্যে রয়েছে একফালি মভূমি ।এ লাদাখের অন্যান অঞ্চলের মতো শীতল কঠিন তুষারম নয়। এ আমাদের চিরচেনা ঝুরো বালির রাজস্থানী ম ভূমি। এই মভূমিতে সত্যি সত্যি উট ঘুরে বেড়ায়, এবং তাদের দুখানা কুঁজ। সত্যি সত্যি তারা কাঁটা গাছ খায় এবং তারা খাবে বলে স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ কাঁটা গাছের চাষ করে। এই ম দেখলে আদৌ ভয় হয় না, বরং তার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে ইচছাকরে, কারন এর দুদিকে রয়েছে তৃণভুমির সবুজ পাড়। সব যেন ডিজনিল্যান্ডের মত খেলাঘরের জিনিস। আসলে এটি একটি বড় সড় পরিত্যক্ত নদী উপত্যকা। অদুরে খাত বদলে সে নদী এখনও বইছে। মাটি এখানে নরম এবং গাছপালা প্রচুর। বিশেষত এখন এই মনোরম গ্রীষ্মে আমাদের টুরিস্ট কটেজের বাগানে প্রচুর মরসুমি ফুল ফুটেছে এবং আপেলে ভর্তি নাতি উচচ গাছগুলি থেকে দিনরাত টুপ্ টুপ্ করে আপেল মাটিতে ঝরে পড়ছে। আপেলের অধঃ পতন দেখে আমাদের মনে নিউটনের মতো কোনো বৈজ্ঞানিক কৌতূহল অবশ্যই উদয় হয় নি। কিন্তু আহলাদ ও উত্তেজনার আর অবধি ছিল না। একটানা ধূসর দেখে দেখে আমাদের ক্লান্ত চোখ ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই সবুজের জন্য তৃষিত হয়ে উঠেছিল। তা না হলে হিমালয়ের যে ধ্যানগম্ভীর প এতদিন ধরে দেখছিলাম তার পাশে হুন্ডার গ্রামের এই সাজানো বাগান নিত্যন্তই সামান্য।

প্যানগং হ্রদের কথা (এবং সোমোরিরি হ্রদ ও) না বললে লাডাখ বৃত্তান্ত অসম্পুর্ন থেকে যায় । হিমালয়ের কোলে বরফ শীতল উচচতায় এই প্রশস্ত হ্রদ গুলি প্রকৃতির এক বিস্ময়। লাদাখের দক্ষিন পূর্ব দিকে চীন সীমান্তের কাছাকাছি আছে প্যানগং হ্রদ। আমাদের বাসস্থান লে শহর থেকে এর দূরত্ব এমন কিছু বেশি নয়। সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় স্বচছন্দে ফিরে আসা যায়। কিন্তু চাইলেই সেটা সব সময় করা যায় না, কারন পথে পড়ে এক খামখেয়ালি নদী। হ্রদের আনুমানিক দু-কিলোমিটার আগে একটি ক্ষীণ জলধারা পার হতে হয়। আমাদের চোখে নালা ছাড়া কিছু নয় এবং তার উপর দিয়ে

গাড়ি চালানোর কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু নদী বা নালা বা ঝর্না যাই হোক তার এইরকম পোষমানা বাধ্যবিনীত চেহারা শুধু সকালে। প্রতিদিন যত বেলা বাড়ে উঁচু পাহাড়ের বরফ সূর্যালোকে গলতে থাকে আর ঝর্নার জল ক্রমশ বাড়ে। তার পর খারাপ আবহাওয়া যোগ হলে তো আর কথাই নেই। তখন কোনো গাড়ি ঐ জলের উপর দিয়ে যেতে পারে না। এতই তার ক্ষুরধার গতি। আবার রাত নামলে ঝিঁ প্রকৃতি শীতল থেকে শীতল তর হয়। পাহাড়ের বরফ জমাট বাঁধে আর শীর্ন নদী শান্ত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। এই নদীর মেজাজ মর্জি বুঝে চলেন শুধু টুরিস্টরা নয়, ওপারের সৈন্য শিবিরের লোকজন ও।

অবশেষে ফেরা। পঞ্চাশ মিনিটের বিমান যাত্রার শেষে আমরা জম্মু শহরের মাটি স্পর্শ করলাম। অবতরনের প্রাক্কালে যথারীতি ধন্যবাদ ইত্যাদি দিয়ে বিমানসেবিকা আমাদের অবগতির জন্য জানালেন বাইরের তাপমান এখন ছাবিবশ ডিগ্রি সাত পয়েন্ট সেলসিয়াস। তখন সকাল মাত্র সাড়ে আটটা। মাঝদুপুরে জম্মু শহরের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে মনে হলো এতক্ষনে আমাদের চেনা পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। চারদিকে তীব্র তাপ। রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। সেই রোদ্দুর সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পথ দিয়ে চলছে জনস্রোত, রাস্তার দুধারে বড় বড় বাড়ি , হোটেল, অফিস, সুপারমার্কেট প্রভৃতি। গাড়ি ঘোড়া চেঁচামেচি, অটোস্টান্ডঅটোচালকদের জটলা ও ঝগড়া, ফ্লাইওভারের নিচে হকার্স কর্নার থেকে দোকানিদের ডাকাডাকি,মোড়ে মোড়ে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে শান্ত্রীদের গুচ্ছ, কত না অর্থ কত অনর্থ, আবিল করিছে স্বর্গমর্ত, তপন তপ্ত ধুলি আবর্ত উঠিছে শূন্য আকুলি। এটাই আমাদের জগৎ। মাঝে কয়েকটা দিন ছিল স্বপ্নমাত্র।